গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৩ - ২৯ জুন, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

শিল্পের নামে জমি দখল

কৃষকদের প্রতি চরম বঞ্চনা

''তোমাদের মতো কোম্পানিকে আকর্ষণ করার জন্য আমরা পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি, জঙ্গল ধ্বংস করেছি, স্রোতস্বিনী নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়েছি, জনপদের মানুষজনকে বাস্তুচ্যুত করেছি — এসব তোমাদের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, তোমাদের বাণিজ্য করতে যেন সুবিধা হয় এবং তোমরা আমাদের মাটিতেই যেন বাণিজ্য কর'' — এই ভাষায় 'ফরচুন' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ফিলিপাইন সরকার বহুজাতিক পুঁজিকে সেদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বিজ্ঞাপনের এই ভাষা বঙ্গবাসীর এখন খুব একটা অজানা নয়। কারণ, 'উন্নততর বামফ্রন্ট' সরকারের মুখ্যমন্ত্রী দেশে-বিদেশে শিল্পপতি পরিবেষ্টিত হয়ে বারবার একই ভঙ্গি ও ভাষায় এ কথাই প্রচার করছেন।

পুঁজির সন্তুষ্টির জন্য সপ্তমবার ক্ষমতায় বসে বুদ্ধবাবুরা জোরকদমে কৃষক উচ্ছেদে মনোনিবেশ করেছেন। যুক্তি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন — ''কর্মসংস্থানের পথ খুলতে হবে আমাদের। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের কাজ চাই। এই কাজের ব্যবস্থা করতেই রাজ্যে শিল্প গড়তে হবে, আর সেই শিল্পের জন্য জমি দরকার।'' (আনন্দবাজার, ২৯-০৫-০৬)। একই সুরে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন — ''যাঁদের জমি নেওয়া হবে, তাঁদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সরকার সেই ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ তৈরি করেছে'' (সূত্র ঃ ঐ)। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের বক্তব্য হল — ''জমির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টা কৃষকদের কাছে গিয়ে ভাল করে বোঝাতে হবে'' (আনন্দবাজার, ৩০-০৫-০৬)। অর্থাৎ সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল সবাই তথাকথিত শিল্পায়নের জন্য কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদের প্রশ্নে কমবেশি সহমত, কেবল বিরোধীপক্ষে থাকার সুবাদে তাঁরা বলছেন, 'ক্ষতিপূরণের বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।' সম্প্রতি নতুন করে ৩২ হাজার একর কৃষিজমি দখলের পরিকল্পনায় সিঙ্গুরের কৃষকদের উচ্ছেদপর্বে এই ধরনের যুক্তির আমদানি করা

চারের পাতায় দেখুন

এইড্‌স বিরোধী বিজ্ঞাপন

সমাজের নৈতিকতা ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্র

এইডস্ বিরোধী ঢালাও প্রচারে খোদ রাজ্য সরকার তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত বুলাদির মুখ দিয়ে যে ভাষায় উপদেশ দিচ্ছে, স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে রেডিও-টিভিতে যে ভাষায় ও ঢঙে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। কী এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য? এইডস্-এর অভিশাপ থেকে নাগরিকদের মুক্ত করা? যৌন স্বেচ্ছাচার এইডস্-এর অন্যতম কারণ এটা ঠিক। কিন্তু বুলাদি বা অন্যান্য সরকারি বিজ্ঞাপন স্বেচ্ছাচার মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন যৌনাচারের পরামর্শ দিচ্ছে না। অনৈতিক অবাধ যৌনাচার সত্ত্বেও এইডস্-এর বিপদ যাতে না ঘটে তার রাস্তা দেখাচ্ছে। অথচ অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার ছাড়াও, এইডস্ রোগীর ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সূচ, সিরিঞ্জ বা রক্ত ট্রান্সফিউশন থেকেও এইডস্ ছড়ায় এবং ছড়াচ্ছেও। এ রাজ্যে বাতিল সিরিঞ্জ ধুয়ে বিক্রির ব্যবসাও রমরমিয়ে চলছে। রাজ্য সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব, তাই বুলাদিও নীরব। ফলে

এইডস প্রতিরোধের নামে অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচারের বিরুদ্ধে ২৫ মে কলকাতায় বিক্ষোভ

সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাগরিকদের মনে সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় যখন দেখা যায়, বুলাদির উপদেশের সঙ্গে রাজ্য সরকার প্রবর্তিত জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যের আশ্চর্য মিল। দেশজুড়ে সরকারি উদ্যোগে মদ, পর্নোগ্রাফি, উত্তেজক যৌন প্রচার, সংবাদপত্রের পাতায় লজ্জাহীন ছবি, ফ্যাসান প্যারেডের মোড়কে নারীদেহের উন্মুক্ত প্রদর্শনী, নিষিদ্ধ আমোদের নগ্ন হাতছানি — সবই চলছে খোলাখুলি। এসবের লক্ষ্য মানুষের প্রবৃত্তির উপর বিবেকের শাসনকে শিথিল করে দেহকে নিছক উপভোগের বস্তু হিসাবে দাঁড় করানো। যৌনশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যৌন নীতিশিক্ষাকে বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারের লক্ষ্য যেমন নিরাপদ যৌন ব্যাভিচারের রাস্তা দেখানো, তেমনই বুলাদিরও লক্ষ্য হল এইডস্-এর ভয়ে যারা গণিকালয়ে যেতে বা অবাধ যৌনাচারে ভয় পান — তাদের ভয় ভেঙে নৈতিক অধঃপতনের নিরাপদ পথ দেখানো।

মানুষ আজ অসহনীয় সমস্যায় জেরবার। শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, চাষী জমি হারাচ্ছে, বন্যা-ভাঙনে সর্বস্ব হারাচ্ছে মানুষ। একুশ শতকে নিছক অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। ফসলের দাম না পেয়ে চাষী আত্মহত্যা করছে। কর-দর-মূল্যবৃদ্ধির

সাতের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেল

দামের অর্ধেকেরও বেশি সরকারি ট্যাক্স

পেট্রল-ডিজেলের দাম যত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ট্যাক্সের ভাণ্ডার ততই বিপুলাকারে ফুলেফেঁপে উঠছে। তেলের উপর সরকারের এমন বিপুল হারে ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর খবরটি বহুকাল ধরেই চাপা ছিল। মানুষকে স্পষ্টভাবে তেমন কিছু কোনদিনই জানতে দেওয়া হয়নি। সরকার মানুষকে বোঝাতো, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ছে, ফলে এদেশে তেলের দাম বাড়বেই। আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরেই এর প্রতিবাদ করে এসেছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলি তা প্রকাশ করত না। এখন তারাও একই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষও এখন বুঝতে পারছে যে, মূলত সরকারি ট্যাক্সের কারণেই তেলের দাম এত বাড়ছে। কিন্তু সেই ট্যাক্সের হারটা কত, তা অনেকেরই অজানা। সরকার বলে — সব দেশের সরকার এভাবেই নাকি তেলের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আয় করে। প্রশ্ন হল, তাই যদি হয় তবে একই আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতিবেশি দেশগুলিও তো তেল কিনছে, তবু তাদের তেলের দাম ভারতের থেকে এত কম কেন? আসলে অন্য দেশগুলির চেয়ে এদেশের সরকার তেলের উপর অনেক বেশি শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে বলেই এদেশে তেলের এত দাম।

আমাদের এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোন দেশেই তেলের এমন চড়া দর নেই। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে পেট্রল-ডিজেলের উপর সরকারি অন্তঃশুল্কের হার যেখানে ২ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় এই শুল্কের হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও যেখানে ২৩ শতাংশ, সেখানে আমাদের ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এই শুল্ক চাপিয়েছে ৩২ শতাংশ। শুধু তাই নয়, ১৯৯১ সালে ইরাক যুদ্ধের অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার লিটার পিছু অতিরিক্ত ১ টাকা সেস চাপিয়েছিল। যুদ্ধ কবে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই সেস আজও চাপানো আছে এবং এখনও দেশবাসীকে তা গুনতে হচ্ছে।

এইভাবে শুধুমাত্র কর চাপিয়ে ২০০৪-০৫ সালে ভারত সরকার পেট্রল-ডিজেলের থেকে আদায় করেছিল ৩৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ সালে তা বেড়ে হয় ৪৮ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এবং এই হারে ২০০৬-০৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের থেকে তুলবে ৬২ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা। এই ছক কষে সরকার এগুচ্ছে।

এবার আসা যাক, রাজ্যে রাজ্যে বিক্রয়কর প্রসঙ্গে। প্রতিবেশি এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দেশগুলির তেলের উপর বিক্রয়করের হার যেখানে গড়ে ১২-১৭ শতাংশ, সেখানে ভারতে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের চাপানো বিক্রয়করের হার গড়ে ২০ শতাংশের বেশি। যেমন সি পি এম শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিক্রয়কর চাপিয়েছে পেট্রলে ২৭.৭৮ শতাংশ ও ডিজেলে

তিনের পাতায় দেখুন

ভাঙা নদীবাঁধ মেরামতের দাবিতে নামখানায় মন্ত্রী ও বিধায়ককে ডেপুটেশন

প্রতি বছরই সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধ ভাঙার সমস্যা দেখা দেয়। গত বছর নামখানা ব্লকের বিভিন্ন স্থানেও বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। মৌসুনির বালিয়াড়া দ্বীপ তো নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে। সেসময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত বাঁধ মেরামতের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি — সর্বস্বান্ত অসহায় মানুষগুলির জীবন নিয়ে চলছে ছিনিমিনি খেলা।

গত ২ জুন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর ও সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক মিলন পড়ুয়া নদীবাঁধ পরিদর্শন করতে মৌসুনি যান। সেসময় এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে মন্ত্রী ও বিধায়কের হাতে এক দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। অন্যতম দাবিগুলি ছিল ঃ জীর্ণ ও ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধগুলি অবিলম্বে মেরামত করতে হবে, সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে ঐ সংস্কারের কাজ করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দিতে হবে, মেরামতির 'ওয়ার্ক অর্ডার' জনসমক্ষে টাঙাতে হবে এবং নদীগুলির সংস্কার করে জোয়ারের গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে। উপস্থিত জনসাধারণ ঐ দাবিপত্র প্রকাশ্যে পড়ে শোনানোর দাবি করলে সভার পক্ষ থেকে তা পড়ে শোনানো হয়। নিজেদের মনের কথা ঐ দাবিপত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠায় জনসাধারণ বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। সেচমন্ত্রী ও বিধায়ক দাবিগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস প্রতিভা মিশ্র, কমলেন্দু পাণি ও শম্ভু ভূঞা।

ঝাড়খণ্ড

এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল

৩০ মে এ আই কে কে এম এস পোটকা ব্লক কমিটির উদ্যোগে জনগণের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং ১৭ দফা দাবিপত্র বিডিওর অনুপস্থিতিতে সি ও-র কাছে পেশ করা হয়। প্রত্যেক গ্রামে সেচের জন্য বাঁধ-পুকুর-ক্যানেল নির্মাণ, খেতমজুরদের সারা বছর কাজ, চাষীদের কম দামে সার-বীজ-কীটনাশকের ব্যবস্থা, কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা, সকল গরিবের মধ্যে আই আর ডি পি সুবিধা সহ কার্ড ও অন্ত্যোদয় কার্ড বিতরণ, সকল অসহায় বৃদ্ধাকে পেনসন, চাষীদের ফসলের বিমার সুযোগ, প্রত্যেক গ্রামে বিনামূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ব্লকের সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং প্রত্যেক পঞ্চায়েতের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও প্রসবের ব্যবস্থা, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্থায়ী সরকারি শিক্ষক নিয়োগ, ব্লকের মধ্যে একটি সরকারি কলেজ স্থাপন, জনবিরোধী ভ্যাট আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবি পেশ করা হয়।

ব্যানারে সুসজ্জিত, স্লোগানে মুখর গরিব চাষী-মজুর-মহিলাদের এক মিছিল বিডিও অফিসের সামনে সমবেত হয়। মিছিলের পক্ষ থেকে সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড বিমল দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সি ও-র কাছে স্মারকপত্র পেশ করেন।

মুম্বইয়ে শিক্ষা কনভেনশন

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, ফোরাম এগেনস্ট কমার্শিয়ালাইজেশন অব এডুকেশন এবং জনমুক্তি সংঘর্ষ বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে মুম্বই-এর জনতা কেন্দ্রে গত ২৮ মে 'শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণবিরোধী কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'শিক্ষা মৌলিক অধিকার এবং সরকারের দায়িত্ব'। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ঊষাবেন ঠক্কর কনভেনশনের উদ্বোধন করেন। কনভেনশনে চারটি অধিবেশন ছিল। প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করেন সমাজকর্মী বিদ্যাভাই চৌহান, পরিচালনা করেন ডঃ শ্যাম পোফলে, আলোচনা করেন কুমার কুলশ্রেষ্ঠ, ডঃ বিবেক কোরডে এবং অধ্যাপক ঈশ্বর আহির। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কুমার কুলশ্রেষ্ঠ এবং আলোচক ছিলেন অধ্যক্ষ পি জি চৌহান, শশীকান্ত রাসাল, অধ্যাপক সুরেশ রানাডে, আলাউদ্দিন সেখ, সরেশ আহির, সঞ্জয় বারি, ভাউরাও তুলে, এস কে আইয়ার, কেদারনাথ পান্ডে প্রমুখ। তৃতীয় অধিবেশনে ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। চতুর্থ অধিবেশনে প্রতিনিধিরা ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে বক্তব্য রাখেন। কনভেনশনে একটি উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

কলকাতা

নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

এ আই ডি ওয়াই ও'র খিদিরপুর আঞ্চলিক কমিটি ও কবিতীর্থ কাজী নজরুল ইসলাম শতবার্ষিকী কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ১১ জুন কাজী নজরুল ইসলাম প্রাইমারি স্কুলে কবির জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট শিল্পী অরুণ সরকার সভাপতিত্ব করেন এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পিন্টু প্রতিহার নজরুলের সাহিত্য, কবিতা ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ভয়াবহ লোডশেডিং এর জন্য গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে — অ্যাবেকা

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ১৬ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ''কলকাতাসহ রাজ্যের সর্বত্রই লোডশেডিং এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 'পশ্চিমবঙ্গ এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত' রাজ্য সরকারের এই দাবি যে ঠিক নয়, এই ভয়াবহ লোডশেডিং তা প্রমাণ করেছে। এই লোডশেডিং-এর জন্য সি ই এস সি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে, গ্রাহকদের প্রতি ঘণ্টায় ২৫ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে এই দাবি কার্যকর করার জন্য ও লোডশেডিং অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতেসি ই এস সি ও পর্ষদকে নির্দেশ দিতে হবে।''

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

ঝাড়খণ্ড

গত ৭ জুন জামসেদপুরের সাকচী গোলচক্করের সামনে পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস লিলি দাশ, সুমিত রায়। সভা পরিচালনা করেন কমরেড অসিত রায়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের সিংভূম জেলা সম্পাদক কমরেড রণজিৎ মোদক এবং কমরেডস বিমল দাশ, অশোক গুপ্তা, বিপ্লব কুমার, রাজু প্রমুখ।

মধ্যপ্রদেশ

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ৭ জুন সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে জবলপুরে কাঁচঘর চকে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড ভবানী ঘোষ। তিনি অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি করার সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান। সভা শেষে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মুরলী দেওরার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

মুম্বাইয়ে যুক্ত বিক্ষোভ

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর মুম্বই সাংগঠনিক কমিটি এবং সি পি আই (এম-এল)-এর যৌথ উদ্যোগে ৭ জুন আজাদ ময়দানে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর মুম্বই কমিটির সম্পাদক কমরেড এ কে ত্যাগী, কমিটি সদস্য কমরেডস্ কুমার কুলশ্রেষ্ঠ, জয়রাম এবং সি পি আই (এম-এল)-এর কমরেড সঞ্জয় সিংভী।

বোকারো

বোকারোর বিরসা চকে এদিন এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড শঙ্কর সিংহ। বক্তব্য রাখেন দলের বোকারো জেলা সম্পাদক কমরেড আর এস শর্মা এবং কমরেডস্ হরিপদ মাহাত, ডি পি চৌরাসিয়া, মনোজ কুমার প্রমুখ। সভা শেষে তেলের মূল্যবৃদ্ধিকারী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতীক একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

৭ জুন পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে জবলপুরে বিক্ষোভ

বীরভূমে পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন ও দাবি আদায়

বীরভূমের বানিওড় গ্রাম পঞ্চায়েত ও কুরুমগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রামে প্রকৃত শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজ ও পরিচয়পত্র, বিপিএল কার্ড, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, পাট্টাদারদের পাট্টা সহ এলাকার নানা সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয় যথাক্রমে ৮ জুন ও ১৩ জুন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নলহাটি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক আব্দুস সালাম সহ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ। আলোচনায় উভয় পঞ্চায়েত প্রধানই বেশ কিছু দাবি মেনে নিয়েছেন।

বিধানসভার প্রথম দিনেই

রাজ্য সরকারকে বিড়ি শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর এ রাজ্যের বিড়ি শ্রমিকরাই প্রথম এই সরকারকে শ্রমিকবিরোধী আখ্যা দিয়ে ১২ জুন কলকাতায় বিক্ষোভ দেখালেন।

এইদিনই নবনির্বাচিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে। বিড়ি শ্রমিকদের কাছে এই দিনটি একই সঙ্গে শোক ও সঙ্কল্পের দিন। ২০০২ সালের ১২ জুন সিপিএম-ঘনিষ্ঠ মালিক কর্তৃক পিএফ আত্মসাতের বিরুদ্ধে বিড়ি শ্রমিকদের দুর্বার আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলার বৈষ্ণবডাঙা গ্রামে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন বিড়ি শ্রমিক শেখ মুজিবর রহমান। শহীদের স্মৃতি বুকে নিয়ে এদিন তপ্ত রাজপথে দৃপ্ত পদক্ষেপে মহাকরণ অভিযানে সামিল হন হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক। রানি রাসমণি রোডে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁরা শপথ নেন — ১২ দফা দাবি সনদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। রাজ্যের চতুর্দশ বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে সপ্তম সিপিএম ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা এক স্মারকলিপিতে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দাবিগুলির অবিলম্বে সুরাহা না হলে রাজ্য জুড়ে শুরু হবে লাগাতার ধর্না, পথ অবরোধ, আইনঅমান্য এবং ধর্মঘট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সপ্তম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর এই প্রথম একটি সরকারবিরোধী শ্রমিক বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করল মহানগর কলকাতা।

বিড়ি শ্রমিকদের মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিল ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী পরিচালিত 'বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনে'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। রাজ্যের বিড়ি উৎপাদনকারী প্রায় সমস্ত জেলা থেকে হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক মহাকরণ অভিযানের জন্য জমায়েত হয়েছিলেন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। প্রচণ্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে আসা রাতজাগা বিপুল সংখ্যক শ্রমিক মহাকরণ অভিমুখে মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নারী শ্রমিক। কিন্তু রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি বা দাবদাহজনিত কষ্ট ম্লান হয়ে যায় মিছিলকারীদের দৃপ্ত পদক্ষেপে এবং উচ্চারিত সম্মিলিত স্লোগানে। রানি রাসমণি রোডে এলে বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানেই শুরু হয় প্রতিবাদী সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুস সঈদ। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপিটি শ্রমিকদের সামনে পাঠ করেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। ডিজেল-পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির নিন্দা করে এবং তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে সভায় প্রস্তাব পেশ করেন মেদিনীপুর বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মধুসূদন বেরা। স্মারকলিপি ও প্রস্তাবের পক্ষে বলেন রাজ্য কমিটির সহসভাপতি ও মুর্শিদাবাদ জেলার নেতা কমরেড সেখ আব্দুল খালেক এবং অন্যতম সহসভাপতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন — এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারাই প্রথম সরকারবিরোধী মিছিল সংগঠিত করেছেন এবং দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের শপথ নিয়েছেন। এর জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সর্বভারতীয় অন্যতম সম্পাদক ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় অন্যতম সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। তিনি বলেন — মালিক, ঠিকাদার ও সরকারের ত্রিমুখী শোষণ-বঞ্চনার শিকার সারা দেশের ৮০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের সাথে এ রাজ্যের সাড়ে ১২ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক। সরকারি ন্যূনতম মজুরি এ রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ১০২ টাকার বেশি। কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিক পান ২২ টাকা থেকে শুরু করে ৪০ টাকা। সরকারি নির্দেশ ও সুপ্রিম-কোর্টের রায় অনুযায়ী সকল বিড়ি শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন স্কিমের আওতায় আসার কথা। কিন্তু রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিকের পি এফ নেই। মালিকরা ন্যূনতম মজুরি ও পি এফ আইনের তোয়াক্কা না করে শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করছে। তবুও সরকার শুধু নির্বিকারই নয়, তারা আইনভঙ্গকারী মালিকদেরই তোয়াজ করছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন — এই সরকার কার পক্ষে? তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের টাকায় তৈরি বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের উপর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক অযথা নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারি করছে, বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পগুলোকে বেসরকারীকরণ করার এবং বাস্তবে শ্রমকল্যাণ দপ্তর তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। মালিক এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এইসব শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কমরেড অশোক দাস, সেখ আব্দুল খালেক, মধুসূদন বেরা, নৃপেন কার্যি, মোক্তার আহমেদ মহাকরণে গিয়ে দাবি সনদ পেশ করেন।

দামবৃদ্ধিতে জনগণের সর্বনাশ, সরকারের পৌষমাস

একের পাতার পর

২০.৭৩ শতাংশ হারে (কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য)। এর সঙ্গে লিটার প্রতি চাপানো আছে রাজ্য সরকারের ১ টাকা সেস।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, তেলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো অন্তঃশুল্ক ও সেস, এবং রাজ্য সরকারের চাপানো বিক্রয়কর ও সেস যোগ করলে যা দাঁড়ায়, সেটা তেলের মোট দামের অর্ধেকেরও বেশি। ঐ শুল্ক, ট্যাক্স ও সেস বাদ দিলে পেট্রল-ডিজেলের বাজারদর অর্ধেকেরও নীচে নেমে যায়। কিন্তু সরকারগুলো তা করতে রাজি নয়। বরং আন্তর্জাতিক বাজারে দামবৃদ্ধির অজুহাতে তারা আরও তেলের দাম বাড়াচ্ছে। তারা জানে যে, এর ফলে সাধারণ মানুষ ভুগবে, সর্বস্তরের মূল্যবৃদ্ধির কোপ তাদের ঘাড়ে পড়বে, তবুও বাড়াচ্ছে। কেন বাড়াচ্ছে? বাড়াচ্ছে এই কারণে যে, বর্দ্ধিত দামের ফলে সরকারের শুল্ক ও ট্যাক্স আদায় আরও বাড়বে, সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডার আরও ফেঁপে উঠবে এবং তেল কোম্পানিগুলো দেদার মুনাফা লুটবে। এটাই সরকারগুলোর লক্ষ্য। এ থেকে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে তারা যত ভাষণ দিক না কেন, তা নিছক ধাপ্পা; বাস্তবে জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে সরকারগুলি মোটেই ভাবিত নয়।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তেলের দাম বাড়াচ্ছে, এবং পাশাপাশি নিজেদের শাসিত রাজ্য সরকারগুলিকে দিয়ে অতি সামান্য কিছু বিক্রয়কর কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়ে কৌশলে বাজিমাত করতে চাইছে; বোঝাতে চাইছে, কেন্দ্র দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে এবং কংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলি জনস্বার্থ রক্ষায় নিজেদের বিক্রয়কর কমাচ্ছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য দল শাসিত রাজ্য সরকারগুলিকেও বিক্রয়কর কমাতে বলছে কেন্দ্র। এই অবস্থায় সিপিএম-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যারা নিজেদের গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় চ্যাম্পিয়ান বলে দাবি করে, তারা কী করছে? তারা বলছে — আগে কেন্দ্র তাদের চাপানো অন্তঃশুল্ক কমাক, তারপর তারা বিক্রয়কর কমাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে., কেন্দ্রের আগেই সিপিএম সরকার বিক্রয়কর কমাচ্ছে না কেন? কোথায় তাদের আটকাচ্ছে? কেন্দ্র না কমালে তারা কমাবে না — এটা কোন যুক্তি হল? তাদের এই দরাদরিতে তো সাধারণ মানুষই ভুগছে। তারা নিজেরা ট্যাক্স কমিয়ে সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক, কেন্দ্রের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করুক। কেন্দ্রীয় সরকার তো তাদের সমর্থনেই টিকে আছে। সেই কেন্দ্রকে তারা হুমকি দিক যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করে না নিলে তারা সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে, সরকার ফেলে দেব। জনস্বার্থবিরোধী এই পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সিপিএম সমর্থন তুলে নিক। সেটা তারা কোনমতে করবে না, এমন চাপ তারা কখনও কেন্দ্রকে দেবে না। কংগ্রেস যতই জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলুক না কেন, তাকে টিকিয়ে রাখতে সিপিএম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানেই তাদের বাধ্যবাধকতা। বাংলা দৈনিকে তাই সংবাদের শিরোনাম — 'কড়া' নোট, তবু কেন্দ্রের সঙ্গে একমত বামেরা (আনন্দবাজার, ১৬-৬-০৬)। সেজন্য, তারা কেন্দ্রবিরোধী লোকদেখানো তরজা-লড়াই প্রদর্শন করলেও দেশব্যাপী এমন কোন জোরদার আন্দোলনে যাবে না, যাতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বিব্রত হয়।

সিপিএম নেতারা দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গে গোপন বৈঠকে তেলের দামবৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়ে আসেন; আবার বাইরে বেরিয়ে দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গরম বিবৃতি দেন, কেন্দ্রকে 'কড়া' নোট পাঠান, রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ সভা করেন। সম্প্রতি দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরি স্বীকার করেছেন, ''আমরা এই সরকারকে দু-দুবার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবার অনুমতি দিয়েছি'' (গণশক্তি' ২৩-৫-০৬)। অথচ প্রতিবারই তেলের দামবৃদ্ধির সময় তাঁরা প্রতিবাদী গরম বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়ে রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীকে বুঝিয়েছেন যে, তাঁরা এই দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। কী রকম মিথ্যাচার! এবারও সিপিএমের প্রতিবাদ শুনে কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম মন্ত্রী মুরলি দেওরা বলেছেন, 'সিপিএমের সঙ্গে আলোচনা করেই তো এবারও পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে' (সংবাদ প্রতিদিন, ৬-৬-০৬)। এরপরও সিপিএম বিক্ষোভ দেখাবে শুনে তিনি বলেছেন — 'তাহলে আর কী করব! সিপিএম নেতাদের গলায় মালা দিয়ে আসব।' বোঝাই যায় — আসল বোঝপড়া কেমন। এবার সিপিএম কেন্দ্রের কাছে 'কড়া' নোট পাঠিয়েছে, দিল্লিতে নেতারা গ্রেপ্তারবরণের নাটক করেছেন। তাদের শ্রমিক সংগঠন সিটু একদিন দুপুর ১২টা থেকে ৫ মিনিটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চাক্কা জ্যাম করেছে। কী বিরাট প্রতিবাদ! কিন্তু জনস্বার্থ সত্যি সত্যি রক্ষা হবে — তেমন একটি পদক্ষেপও তারা নেয়নি। তেলের উপর সিপিএম সরকারের চাপানো বিক্রয়করের একটি পয়সাও যেমন কমায়নি, তেমনি কেন্দ্রকেও বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে কার্যকরী কোন চাপ দেয়নি।

সিপিএমের সমর্থনের উপরই যখন কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তখন সিপিএম নেতারা কেন সমর্থন প্রত্যাহারে হুমকি দিয়ে জনবিরোধী পদক্ষেপ বন্ধ করতে কংগ্রেসকে বাধ্য করছেন না — এই প্রশ্ন তুললেই সিপিএম নেতারা বলেন, কংগ্রেস সরকার পড়ে গেলেই বিজেপি এসে যাবে, জনগণের সর্বনাশ হবে! এই চালাকির যুক্তিতে কেবল সিপিএমের কর্মীদের নেতারা বিভ্রান্ত করছেন তাই নয়, দেশের বুদ্ধিজীবীদেরও এক অংশকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন। সিপিএমের এই যুক্তি মেনে নিলে দাঁড়ায় যে, বিজেপি'র চেয়ে কংগ্রেসের শাসন বাল, অর্থাৎ জনগণের পক্ষে কল্যাণকর, যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। গত ২৪ মাসের ইউ পি এ শাসন প্রমাণ করে দিয়েছে যে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির কোনও ক্ষেত্রেই বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। বহুক্ষেত্রেই বিজেপি-র অপশাসন যেখানে শেষ হয়েছিল, কংগ্রেসের অপশাসন সেখান থেকে শুরু হয়ে দু'বছরেই বহু ক্ষেত্রে তা বিজেপি-কে ছাপিয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাও যে কংগ্রেসের মুখে ফাঁপা বুলি ছাড়া কিছু নয়, তাও প্রমাণিত। কংগ্রেসকে সমর্থন করে বিজেপি রোখার যে তত্ত্ব সিপিএম বাজারে ছেড়েছিল, তাকেও ভুল প্রমাণ করেছে বিহারের নির্বাচনে বিজেপি-জোটের জয়। আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নাটকের মতোই বিজেপি-কে রোখার বুলি সিপিএমের একটি ছলনা। তাদের আসল মতলব, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কৃষককে ভাতে মেরে জমি দখল কার স্বার্থে

একের পাতার পর

হচ্ছে। হাজার হাজার কৃষককে উচ্ছেদ করে 'শিল্পায়নে' কত বেকারের কাজ হবে, বা কী ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হবে তা আমাদের অজানা। তা ভবিষ্যতের বিষয়। কিন্তু অতীতে এই সরকারের শিল্পায়নের উদ্যোগে কীভাবে বেকাররা কাজ(!) পেয়েছে, বা চাষীরা কী ধরনের ক্ষতিপূরণ পেয়েছে সেই বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের সামনে আছে। সে ইতিহাস থেকে কয়েকটি কথা এখানে আমরা উল্লেখ করব। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে অপর একটি বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। প্রশ্ন হল, কেন দেশি-বিদেশি পুঁজি কলকাতা বা তার আশেপাশের জেলাগুলিতে, এবং অন্যান্য জেলায় বড় বড় শহরের লাগোয়া কৃষিজমি দখল করার ক্ষেত্রে এত উৎসাহ দেখাচ্ছে? কী এর কারণ?

দীর্ঘদিন আগে কমরেড লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন — সম্প্রসারণশীল নগরীর আশেপাশে রিয়েল এস্টেটের (আবাসন নির্মাণ) ব্যবসায় পুঁজি লগ্নি করতে লগ্নিপুঁজি খুবই উৎসাহী। কারণ, এই বিনিয়োগে লোকসানের ভয় নেই, এখানে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি, এখানে লগ্নিকৃত পুঁজির মুনাফা আসে অতি অল্প সময়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা, এক্ষেত্রে শ্রমিক অশান্তির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ সব দিকেই লাভ, একেবারে সোনায় সোহাগা! সর্বোপরি, কম দামে জল - জমি - বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী বিশ্বে সঙ্কট যত তীব্রতর হচ্ছে, উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলো (প্রোডাক্টিভ সেক্টর) যত রুগ্ন হয়ে পড়ছে, অর্থনীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভরতা ত্যাগ করে যত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল সামরিক অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে, **পুঁজি প্রোডাক্টিভ সেক্টরে নিয়োজিত হতে না পেরে যত ফাটকা-বাজারে শেয়ার মার্কেটে দালালির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে — ততই এই রিয়েল এস্টেট সেক্টর তাদের কাছে লোভনীয় সেক্টরে পরিণত হচ্ছে।** তথাকথিত এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে যখন পুঁজি ক্রমশই তীব্র সঙ্কটের মধ্যে পড়ছে, তখন বাঁচার মরিয়া প্রচেষ্টায় এই বিশেষ ক্ষেত্রের গুরুত্ব তাদের কাছে আগের তুলনায় আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই ক্রমপ্রসারণশীল শহরের আশেপাশে জমি দখলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ওদের। সেজন্য আমরা দেখতে পাই, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে 'সংস্কারের' উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে যে একগুচ্ছ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান কথা ছিল — জমির উর্ধ্বসীমা আইন তুলে দিতে হবে (World Bank's Economic Memorandum for India, 1991)। এই সুরে সুর মিলিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির অন্যতম প্রধান সংগঠন 'অ্যাসোচেম'-ও বলেছিল — ''আমাদের ভূমিসংস্কার নীতির উপযুক্ত সংশোধন দরকার।'' (Business India, December 1993)।

দেশি-বিদেশি পুঁজির এই জমির খিদে মেটানোর দায়িত্ব এই রাজ্যে বুদ্ধদেববাবুরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই অপকর্মের উপর তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় একটা জনদরদের তকমা এঁটে দিতে চাইছেন। তা হল — 'জমি দিলে শিল্প হবে, আর শিল্প মানেই চাকরি, চাকরি মানেই উন্নয়ন।' সগর্বে তাই বুদ্ধদেববাবুরা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের উদ্দেশে বলছেন — ''যান, আপনারা গিয়ে বিশ্বকে বলুন, আমরা পাল্টাচ্ছি। আমরা মার্কসবাদীরা মূর্খ নই যে, পুরানো অচল ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকব। বামপন্থীরা এখানে সঠিক পথে চলছে এবং এই রাজ্যই হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগের সঠিক জায়গা।'' (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৪-২-০৫)।

এসব কথার দ্বারা এমন একটা বাতাবরণ ওরা সৃষ্টি করছেন, যেন রাজ্যের শিল্পায়নের গতি রুদ্ধ হয়ে আছে পুঁজির অভাবে। পুঁজি এলেই উন্নয়ন হয়ে যাবে। তাই ওরা বলছেন — 'পুঁজির রং বিচার করা চলবে না।' ভাবখানা এমন যেন বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে এদেশে সবই আছে — বাজার আছে, কেনবার লোক আছে, মানুষের হাতে প্রচুর টাকা আছে, অঢেল চাহিদা আছে, নেই শুধু পুঁজি। সেই পুঁজি নিয়ে আসতে পারলেই এ রাজ্যের উন্নয়নের তরী তরতর করে চলতে শুরু করবে। বাস্তবে পুঁজির অভাবের জন্য যে উন্নয়ন থমকে নেই — এই সত্য পুঁজিবাদী পণ্ডিতরাও জানেন এবং বলেও থাকেন। এটা জানার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে হয় না। বুদ্ধদেববাবুরাও ভালই জানেন যে, এদেশে পুঁজি আছে এবং অঢেল পরিমাণেই আছে। এদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রতিদিন বিপুল পুঁজির সঞ্চয়ও ঘটছে, কিন্তু তার উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ হচ্ছে কি না, সেটাই বড় কথা। তা হচ্ছে না বলেই এদেশে অলস পুঁজির পরিমাণ বাড়ছে এবং তা শেষপর্যন্ত শেয়ার-বাজারে ঢুকছে, ফাটকা-পুঁজির পরিমাণকেই স্ফীত করছে। ফলে পুঁজির স্বল্পতা সমস্যা নয়, শিল্পায়নের আসল সমস্যা হল বাজার সঙ্কট। নতুন নতুন শিল্প হচ্ছে না, কারণ ক্রমবর্ধমান পুঁজির নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ ঘটছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ, বাজার নেই, মানুষের কেনার ক্ষমতা নেই। যে পরিমাণে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে বাজারের সম্প্রসারণ হচ্ছে না। পুঁজিবাদের মূল সমস্যা এখানেই। এটা মার্কসবাদের প্রাথমিক জ্ঞান। একে অস্বীকার করে মুনাফার টোপ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ধরে এনে 'বিনিয়োগ বন্ধ্যা' তকমা গায়ে পরলেই কি উন্নয়ন হবে? 'উন্নয়ন' যে হয় না, বুদ্ধদেববাবুদের বিগত ৬ দফার রাজত্ব তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

> সরকারি সংস্থা ওয়েবকম হিসাব কষে দেখিয়েছে যে, মাত্র ৫০০ টি বন্ধ কারখানায় জমির পরিমাণ ৪০ হাজার একর।

শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান

মহানুভবতার ভড়ং দেখিয়ে সিপিএমের দৈনিক মুখপত্র গণশক্তি লিখেছে — ''গোটা দেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে বুঝতে হবে, বেকারি একটি সর্বভারতীয় সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে থাকতে পারে না। বামফ্রন্ট সরকার বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত বলেই সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান-বাড়ানোর প্রয়াস চালাচ্ছে। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা সব মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের মূল লক্ষ্য হল কর্মসংস্থান।... বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী নীতির ফলে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা সবক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়ছে।'' (গণশক্তি, ১৫-১১-০৫)। অদ্ভুত যুক্তি! যেন বেকারি ও কর্মসংস্থান দুটো আলাদা ব্যাপার। কর্মসংস্থান হলেই বেকারি কমবে — একথা বোঝার জন্য তো দিগ্‌গজ পণ্ডিত হতে হয় না। তাঁরা যুক্তি করছেন, বেকারি কমছে না, কারণ ওটা সর্বভারতীয় সমস্যা। অথচ রাজ্য সরকারের সবক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়ছে — এটা মানতে হবে। দেউলিয়াপনা আর কাকে বলে! সিপিএম নেতাদের দাবি মতো এই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চেহারাটা কেমন?

সংগঠিত শিল্পের চেহারাটা কী? এ রাজ্যে ১৯৯১ সালে বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করতেন ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার মানুষ। কমতে কমতে সেই সংখ্যাটা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষের কাছাকাছি। অর্থাৎ শুধু এই ক্ষেত্রেই গত ১০ বছরে কর্মসঙ্কোচন ঘটেছে প্রায় ৫ লক্ষ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও চলছে অবাধে কর্মসঙ্কোচন। ঐ একই সময়কালে ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর জায়গায় কাজ করছে ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার। অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠানেই ১০ বছরে কাজ হারিয়েছে ২ লক্ষেরও বেশি। এককথায় সরকারি-বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীসঙ্কোচন হয়েছে — প্রায় ৭ লক্ষের কাছাকাছি।

অসংগঠিত শিল্পের অবস্থা? এ রাজ্যে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে বন্ধ-কলকারখানার সংখ্যা প্রায় ২৯ হাজার। এসব কারখানায় প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কর্মহীন। এদের উপর নির্ভরশীল পরিবার পিছু প্রায় ৪ জন। ফলে রাজ্যে ১৬ লাখ মানুষের পেটের ভাত অনিশ্চয়তার মুখে (সংবাদ প্রতিদিন, ২৭-১০-০৫)।

দুনিয়া ঢুঁড়ে বুদ্ধদেববাবুরা যে পুঁজি ধরে আনছেন কর্মসংস্থানে তাদের ভূমিকা কী? লোহা ও ইস্পাত শিল্পে ১৭৫টি শিল্প ইউনিটে বিনিয়োগ হয়েছে ৭,৩৫৯.০৯ কোটি টাকা। এর বেশিরভাগটাই স্টীল ইনগট ও স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনকারী সংস্থা। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে ব্যাঙের ছাতার মতো স্পঞ্জ আয়রন কারখানা গড়ে উঠেছে। এই শিল্পের দূষণ এত মারাত্মক যে, উন্নত দেশ এই শিল্প তৈরি করে না, গরিব দেশে চালান করে। সেই শিল্প গড়ার জন্য বুদ্ধদেববাবুরা পুঁজি ধরে এনেছেন। এই শিল্পে মজুরি অত্যন্ত কম এবং শ্রম আইন নেই বললেই চলে। বাঁকুড়ার বড়জোড়া, মেজিয়া, ছাতনা এবং বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এ ধরনের অনেক কারখানা গড়ে উঠেছে। এই কারখানাগুলোতে কর্মসংস্থানের সেরকম সুযোগ নেই। দৈনিক ৫০-৬০ টাকা মজুরিতে হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ করতে হয় শ্রমিকদের। এক-একটা কারখানায় কাজ মিলেছে বড় জোর ১০০ জনের। অথচ এইসব কারখানার জন্য রাজ্য সরকার প্রচুর ভর্তুকি সহ ঋণের ব্যবস্থা করছে, কম দামে ঋণ দিচ্ছে এবং অন্যান্য হাজারো ধরনের ছাড়ের সুবিধা দিচ্ছে। (আনন্দবাজার, ২৮-৪-০৫)।

দেখা যাক, সিপিএমের তাত্ত্বিক মুখপত্র 'মার্কসবাদী পথ' কী বলছে এ প্রসঙ্গে। বর্ধমানের শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই পত্রিকায় বলা হয়েছে — ''১৬টির মধ্যে তিন-চারটি বাদ দিয়ে বাকি ১২টি সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে এই জেলায় — দুর্গাপুর ইস্পাত থেকে সস্তায় স্ল্যাগের গুঁড়ো পাওয়া এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে। দুর্গাপুর সিমেন্টে যেখানে বর্তমানে শ্রমিক-সংখ্যা ৫০০, সেখানে তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লার্সেন টুব্রোর শ্রমিক মাত্র ২৩ জন। বাকি ১৪টি কারখানার মোট শ্রমিক ১০০০ এর অনেক নীচে। এই কারখানার বেতন ও কাজের পরিবেশ আদৌ ভাল নয়।''

''শিল্পে উন্নত এবং পরিকাঠামো সমৃদ্ধ এই জেলায় একটি মাত্র বিদেশি প্রযুক্তির কারখানা এসেছে। তা হল স্টলবার্গ। বাকি তিনটি কারখানা সানরাইজ, এবিএল, এশিয়াটিক অক্সিজেন কিনে নিয়েছে পেপসি, এলস্টম এবং প্যাক্সএয়ার। কিন্তু এর ফলে না বেড়েছে কাজের সংস্থান, না ঘটেছে কারখানার সম্প্রসারণ। পেপসি ও প্যাক্স এরা কারখানা দুটি বন্ধ করে দিয়েছে। এলস্টম স্থায়ী

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিধানসভায় এস ইউ সি আই-এর মুলতুবি প্রস্তাব

রাজ্যে ব্যাপক ছাঁটাই ও কর্মসঙ্কোচন এবং উর্বর জমি কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বিধায়ক ও পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ১৪ জুন বিধানসভায় একটি মুলতুবি প্রস্তাব আনেন। স্পীকার তাঁকে প্রস্তাবটি শুধু পাঠ করার অনুমতি দেন। প্রস্তাবে তিনি বলেন, ''চটশিল্প থেকে শুরু করে এই রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী শ্রমনিবিড় (লেবার ইনটেনসিভ) শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, যখন রাজ্য সরকার পরিচালিত এবং অধিগৃহীত শিল্প সংস্থাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া বা ব্যক্তিমালিকের হাতে চলে যাওয়ার ফলে শ্রমিক ছাঁটাই আরও তীব্রতর হচ্ছে, যখন চর্তুদিক থেকে ভয়াবহ বেকার সমস্যায় জনজীবন জর্জরিত, তখন ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের শ্রমনিবিড় শিল্পগুলিকে চালু না করে বা শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ার উদ্যোগ না নিয়ে দু'পাঁচটা পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর (ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ) শিল্প গড়া বা তার প্রস্তাব তুলে এই রাজ্যে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের বহুল প্রচার চলছে।

''তাছাড়া, উক্ত শিল্পায়নের জন্য সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের কয়েকটি জেলায় হাজার হাজার একর উর্বর কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে ব্যাপকহারে চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা উদ্বেগজনক। রাজারহাট আবাসন প্রকল্পসহ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে উচ্ছেদ হয়েছে সেখানেই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পেয়ে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকরা নিরাশ্রয় ও অনাহারে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

''শিল্পায়নের জন্য রাজ্যে জমি সংগ্রহের বিকল্প সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার বিভিন্ন শিল্প মালিকদের স্বার্থে হুগলি জেলার সিঙ্গুর সহ রাজ্যের ছ'টি জেলায় ৩২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার অধিকাংশই ২/৩ ফসলি উর্বর জমি। এর ফলে হাজার হাজার চাষী নতুন করে জমিহারা ও বাস্তুচ্যুত হবে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, এমনিতেই নগরায়ণ ও অন্যান্য কারণে বছরে ৫০ হাজার একর জমি কমছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীনতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। গত ৫ বছরে রাজ্যে ২৫ লক্ষ ভূমিহীন খেতমজুর বেড়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৯৫৭ জন। আবার প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যাও বাড়ছে বছরে ৯০ হাজার করে। গত ৫ বছরে কৃষিজমি কমেছে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর। এহেন পরিস্থিতিতে বর্তমানে শিল্পায়নের নামে কোন বাছবিচার না করে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্বিচারে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের এই সর্বনাশা কার্যক্রমের ফলে আরও ব্যাপক পরিমাণে কৃষিজমি ধ্বংস হবে, বিপন্ন হবে রাজ্যের খাদ্য নিরাপত্তা। বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহ ও তীব্ররূপ ধারণ করবে। অনাহারে, অর্ধাহারে গ্রামবাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হবে।

''সে কারণে এই সভা সরকারের এই কৃষক খেতমজুর উচ্ছেদকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং জনস্বার্থে অবিলম্বে এই পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত হওয়ার দাবি জানাচ্ছে।''

‘হাদিথা গণহত্যা’

মার্কিন সেনার নৃশংসতার নয়া নিদর্শন

ইরাক আগ্রাসনের সময় মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বলেছিল, ইরাকে গণতন্ত্র নেই, তারা যাচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। বলেছিল, সাদ্দাম হুসেনের শাসন স্বৈরাচারী, নৃশংস অত্যাচারী ; ইরাকি জনগণ এই অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়, স্বাধীনতা চায়, যা বুশ-ব্লেয়াররা ইরাকিদের দেবে। গত তিন বছর ধরে ইরাক মার্কিন সেনার দখলে। কেমন গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতা সেখানে আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করেছে, তার বহু নিদর্শনের মধ্যে হাদিথা’র যে ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তা শিউরে ওঠার মতো। ঘটনাটা এতই ভয়াবহ যে, ইরাকের পুতুল সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী মালিকি পর্যন্ত তা নিয়ে আমেরিকার কাছে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

আবু ঘ্রাইব কারাগারে বন্দী ইরাকিদের উপর মার্কিন সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন শাসকরা চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। কিউবার ভূখণ্ড বেআইনীভাবে দখল করে তৈরি গুয়ান্তানামো বে-র মার্কিন কারাগারে চারশো জন ইরাকি বন্দীকে কী অমানুষিক বর্বর পরিবেশে আটক করে রাখা হয়েছে, নানা দেশ থেকে কেবল সন্ত্রাসবাদী অভিযোগে বহু ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিনাবিচারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে কীভাবে বন্দি রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, সেই ঘটনাও জানাজানি হয়ে যাওয়ায় এমনকী মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত বিশ্বজোড়া প্রতিবাদের চাপে অবিলম্বে গুয়ান্তানামো বে-র জেলখানা বা ‘আতঙ্কের গুহাটি’কে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জর্জ বুশও এতে সায় দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু এগুলি কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? ইরাকের বুকে হাদিথা গণহত্যার সংবাদ তা বলে না। ঘটনাটি ২০০৫ সালের ১৯ নভেম্বরের। সেদিন ইরাকে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর একটি ডিভিশন ‘হাদিথা’ শহরের নাগরিকদের ঘরে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালায় এবং চব্বিশজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। ঐদিন সকালে রাস্তায় পড়ে থাকা একটি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় এক মার্কিন মেরিন। তারই প্রতিক্রিয়ায় হাদিথা শহরটিকে নিরীহ ইরাকিদের তাজা রক্তে প্লাবিত করে মার্কিন দস্যুর দল। তারা ৭৬ বছরের পঙ্গু এক বৃদ্ধকে হুইল চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় খুব কাছ থেকে গুলি করে, তিনি তখন কোরান পাঠ করছিলেন। সন্তান কোলে নিয়ে বসে-থাকা এক মা-কে পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয়নি। তাদের খতমের তালিকায় রয়েছে চোদ্দ বছরের এক কিশোর, এমনকী পাঁচ, চার, তিন এবং এক বছরের নিষ্পাপ শিশুরাও। সাফা ইউনিস নামে তেরো বছরের একটি মেয়ে এই তাণ্ডব চলাকালে মাটিতে পড়ে যায়। তার মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা অঝোর ধারার রক্তে ভিজে যায় তার শরীর। সেনারা তাকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে চলে গেলে গোটা এলাকা জুড়ে চলা এই নৃশংস গণহত্যার নির্বাক সাক্ষী হয়ে যায় ঐ মেয়েটি।

মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করে হাদিথার হাসপাতালের ডাক্তাররা জানিয়েছেন, অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খুব কাছ থেকে এমনভাবে প্রতিটি গুলি চালানো হয়েছে যে, সেগুলি শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে মেঝেতে অথবা পাশের দেওয়ালে গেঁথে গিয়েছে।

ইরাকের মার্কিন সেনা-কর্তৃপক্ষ প্রথমে এই নৃশংস ঘটনাটিকে চেপে গিয়ে ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে মার্কিন বাহিনীর সরাসরি সংঘর্ষের গালগল্প প্রচার করেছিল। দীর্ঘ কয়েকমাস হাদিথা গণহত্যার ঘটনাটি চাপা পড়েই ছিল। শেষে এ’বছরের মার্চ মাসে ‘টাইম’ পত্রিকা অনুসন্ধান চালিয়ে সেনা অত্যাচারের ঘটনা ফাঁস করে দিয়েছে।

ইরাকের নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ নাগরিকদের উপর মার্কিন বাহিনীর কেন এই আক্রোশ? ঘরের ভিতরে থাকা হাদিথার নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ কিংবা শিশুরা তো মার্কিন সেনাদের কাছে কোনওভাবেই বিপজ্জনক ছিল না! তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় কেন এভাবে তারা রক্তের স্রোত বইয়ে দিল?

আসলে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই মালিক-পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে যে সেনাবাহিনী তৈরি করে, নানা কৌশলে তার সদস্যদের সে অমানুষের স্তরে নিয়ে যায়। এ নাহলে সৈনিকদের দিয়ে অমানুষের কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না। বিবেক, মানবিকতাসম্পন্ন কোনও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে অন্যায়ভাবে আক্রমণ চালিয়ে সেদেশের সাধারণ মানুষকে বিনা প্ররোচনায় হত্যা করা সম্ভব নয়। ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছে মার্কিন সেনাদের ক্ষেত্রেও। খবরের কাগজে যতই তাদের হাসিমুখে শিশুদের মধ্যে লজেন্স বিলি করতে দেখা যাক, বিশেষ পরিস্থিতিতে এরাই আবার পরিণত হয় রক্তলোলুপ দানবে। এদের মনগুলোকে বিশেষ ছাঁচে ঢেলে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে এদের ব্যবহার করে। যদিও সর্বদা তাদের এই ষড়যন্ত্র সফল হয় না। ইরাকে যুদ্ধ করছে যে মার্কিন সেনারা, এই নৃশংসতা সহ্য করতে না পারার ফলে তাদের অনেকেরই মানসিক ভারসাম্য আজ নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের মানসিক অসুস্থতার খবর মিলছে। অনেকেই দেশে ফিরতে চাইছে, ফিরলে আর যেতে চাইছে না।

মার্কিন সেনাদের এই বর্বরতার আরেকটি কারণ হল, ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সম্পর্কে তাদের প্রবল আতঙ্ক। দীর্ঘ তিন বছর ধরে ইরাকের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে দেশটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তারা। সেদেশে মানুষকে গণতন্ত্রের বদলে উপহার দিয়েছে অমানুষিক উৎপীড়ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরাকের বীর দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তারা নিরস্ত্র করতে পারেনি। একটা নাটুকে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ইরাকে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুতুল সরকার, যার সুইচ রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। কিন্তু ইরাকি জনগণ এই সরকারকে মেনে নেয়নি, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতেও এই পুতুল সরকার ব্যর্থ। প্রতিদিন অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠছে মার্কিন কর্তৃপক্ষের দপ্তরগুলি। চরম সুরক্ষিত গ্রীন জোনও মার্কিন কর্তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। সাধারণ ইরাকি নাগরিকদের সাথে প্রতিরোধ যোদ্ধারা এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, কিছুতেই তাদের ধরতে পারছে না মার্কিনবাহিনী। শত প্রলোভনেও ইরাকের মানুষ দেশপ্রেমিক এই যোদ্ধাদের তুলে দিচ্ছে না দখলদারদের হাতে।

আটের পাতায় দেখুন

সিংহ জর্জ হয়ে গেলেন ইঁদুর বুশ

এক মেরু বিশ্বের অধীশ্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ গত ১৩ জুন হঠাৎ ইরাক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। বিশ্বের অধীশ্বর যিনি, বিশ্বের যেকোন দেশের সরকারকে যিনি যখন তখন ফেলে দেওয়ার হুমকি দেন, যেকোন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যার হাতে খেলনার মতো, রাষ্ট্রসংঘকে যিনি পায়ের জুতো মনে করেন, ইচ্ছে হলে পায়ে গলান, না হয় ছুঁড়ে ফেলেন, তিনি একটি পরাজিত ও মার্কিন অধীনস্থ দেশের পুতুল সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে বিদেশে যাচ্ছেন — এ খবরে সাজো সাজো রব পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টো। ইরাক থেকে বুশের বিমান আমেরিকার কেনেডি বিমান বন্দরে ফিরে আসার পরই একমাত্র বুশের ইরাক যাত্রার কথা প্রকাশ করা হয়। জর্জ বুশের গোটা ইরাক গমন পর্বকে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তায় মুড়ে রাখা হয়েছিল। ইরাকে যাওয়ার পথে বুশের হেলিকপ্টারের আলো নিভিয়ে রাখা হয়, এমনকী তাঁর নিরাপত্তার জন্য সামরিক কর্তাদের নিয়ে যে হেলিকপ্টার সাথী হয়েছিল তার আলোও জ্বালানো হয়নি। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মালিকীকেও জানানো হয়নি যে, তাঁর সাথে কথা বলতে জর্জ বুশ ইরাকে এসেছেন। ইরাকের বিমানবন্দর থেকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ঘেরা গ্রীন জোনের ভিতরে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মিনিটের। ঐ রাস্তাটুকুর জন্যই ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। আকাশপথে ভয়, স্থলপথেও ভয়। যদি ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হামলা চালায়। নতুন প্রধানমন্ত্রীর ভয় — মার্কিন সেনা চলে গেলে তার সরকারই টিকবেনা। জর্জ বুশ গিয়ে আশ্বস্ত করে এলেন, মার্কিন সেনা থাকবে। বিশ্বের অধীশ্বর হয়ে যিনি তাঁর তাঁবেদারকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন, তিনি নিজে ইরাকের মাটিতে পা দিয়ে নিরাপত্তার গর্ত খুঁজলেন; পাছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে প্রাণ যায়, সেই ভয়ে চোরের মতো গোপনে ঘুরে গেলেন ইরাক। বিরাট বীরই বটে !

একটা দেশের জনগণ যখন স্বাধীনতার লক্ষ্যে দৃঢ়পণ হয়, তখন দুনিয়ার কোন বড় অস্ত্রশক্তিই যে তাকে দমাতে পারে না, ইরাকের বীর জনগণ আবার তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

দেওয়াল লিখনে নিষেধাজ্ঞার আইন পুরোপুরি বাতিল করতে বিলম্ব কেন

বিধানসভায় প্রশ্ন তুললেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

১৯৭৬ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দেওয়ালে পোস্টারিং ও লিখন নিষিদ্ধ করে যে আইন তৈরি করেন, তারই সুযোগ নিয়ে এবার নির্বাচনের আগে সিপিএম সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রচারে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং নিষিদ্ধ করে। সরকার বলে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতই এই আদেশ জারি করতে হয়েছে। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে এই নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। কেন সিপিএম সরকারের ৩০ বছরের শাসনে এই আইন বাতিল করা হল না — এই প্রশ্নও তোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সেসময় বলেছিলেন, এমন আইনের অস্তিত্বের কথা তিনি নাকি জানতেন না। নির্বাচনের ফল বেরোবার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সপ্তম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই তিনি এই আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত করবেন। কিন্তু ৩১ মে’র প্রথম বৈঠকে সেই সিদ্ধান্তের বদলে ঐ আইনের নানা দিক খতিয়ে দেখার জন্য ৩ জন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই গত ১৫ জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার একটি লিখিত প্রশ্নে, এই আইন বাতিল করার কথা সরকার ভাবছে কি না, তা জানতে চান। অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্থাপন করে তিনি বলেন, গণআন্দোলনকে আঘাত করার জন্যই জনমত প্রকাশ ও জনমত গঠনের অন্যতম গণতান্ত্রিক মাধ্যম দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই কালাকানুন ১৯৭৬ সালে যখন তৈরি করা হয়, তখনই এ রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই আইনকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহারের দাবি তোলেন। যেজন্য আইন করেও সিদ্ধার্থ রায় সরকার তা প্রয়োগ করতে পারেনি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএম সরকার ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে এই আইন বাতিলের উদ্যোগ নেয়নি কেন?

এই প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি জানতেনই না যে এমন একটি আইন রয়েছে। আরও বলেন যে, শুধু তাঁর সরকার নয়, এস ইউ সি আইও এই আইনের কথা জানত না।

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে কমরেড সরকার বলেন, আইনের অস্তিত্ব তাঁদের অজানা ছিল বলে মুখ্যমন্ত্রী যে যুক্তি দিচ্ছেন, তা বিস্ময়কর। কারণ এই আইন প্রণয়নের সময়ই সমস্ত রাজনৈতিক মহল থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন, এস ইউ সি আই-ও এই আইনের কথা জানত না, সেটা তিনি ঘটনা না জেনে বলেছেন। ১৯৭৬ সালে এই আইন প্রণয়নের সময়ই তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আমাদের দলের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে খোলা চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং সেই চিঠি ছাপিয়ে তখন রাজ্যের জনগণের মধ্যে বিলিও করা হয়েছিল। সম্প্রতি আমাদের দলের মুখপত্র গণদাবী পত্রিকায় সেই চিঠি পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে। (গণদাবী পত্রিকার একটি কপি কমরেড সরকার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলে মুখ্যমন্ত্রী ভুল স্বীকার করে নেন)।

এরপর কমরেড সরকার বলেন, আইন প্রত্যাহারের কথা মুখ্যমন্ত্রী মুখে মেনে নেওয়ার পরও অবিলম্বে তা বাতিল করছেন না কেন? এমন একটি কালাকানুন পুরোপুরি বাতিল হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আইনের খুঁটিনাটি বিচার করার অজুহাতে আবার একটা কমিটি গঠন করে আইন বাতিলের বিষয়টা বিলম্বিত করা হচ্ছে কেন? সরকারের এই দ্বিধা ও বিলম্বিত করার চেষ্টার পেছনে গণআন্দোলনবিরোধী দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণীর কোনও চাপ আছে কি?

পরিশেষে কমরেড সরকার বলেন, দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং-এর বিরুদ্ধে তাঁরা দৃশ্য দূষণের অভিযোগ তুলছেন, আইনের কথা বলছেন, অথচ গোটা কলকাতা শহর যখন নানা কুৎসিত ও অশ্লীল হোর্ডিংয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন না কেন? কেন সেগুলো আইনানুগভাবে বাতিল করা হচ্ছে না?

কৃষকরা অসংগঠিত বলেই সরকার জুলুম চালাতে পারছে

চারের পাতার পর

সম্পদের বহু অংশ বিক্রি করে দিয়ে বিনিয়োগের টাকা তুলে নামমাত্র শ্রমিক দিয়ে ঠিকা প্রথায় উৎপাদন করাচ্ছে। স্টলবার্গের শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ১৮ জন, তার মধ্যে স্থায়ী শ্রমিক মাত্র ৬ জন।''

''ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে, নামমাত্র বেতনে অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ করিয়ে, অপরিসীম মুনাফা তুলে নিয়ে কারখানা ফেলে অনেক সময়েই বেসরকারি মালিকেরা পালিয়ে যায় অন্যত্র। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল সিমেন্ট, কাচ, লোহা কারখানাগুলো। এমনকী বহুজাতিক কোম্পানি পেপসি অপরিসীম মুনাফা তুলে নিয়ে সোনারপুরে নতুন কারখানা করে চলে গেছে।'' (মার্কসবাদী পথ, নভেম্বর, ২০০৩)

সিপিএম নিজেই এই স্বীকৃতি দিচ্ছে, আবার সেই দলের নেতারাই 'পুঁজি এলে চাকরি হবে' বলে বেকার যুবকদের ঠকাচ্ছে।

এবার উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া একটি জায়গার কৃষকদের কর্মসংস্থানের হিসাব নেওয়া যাক। সবাই আমরা জানি, ফলতায় কৃষকদের উচ্ছেদ করে দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের জমি দেওয়া হয়েছিল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলবার জন্য। এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কী ধরনের কর্মসংস্থান হয়েছে? আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়, **ফলতায় ২৮০ একর জমিতে সরকারি কোষাগারের কমবেশি দু'হাজার কোটি টাকা খরচ করে কত জন কাজ পেয়েছে? হিসাবটা হল — স্থায়ী কাজ পেয়েছে মাত্র ৪০০ জন, অর্থাৎ একর পিছু মাত্র ১.৭ জন। কৃষিকাজ হলে একরে কাজ পেতেন কমবেশি ৯০ জন।** (শিল্প সহায়তা প্রকল্প, পঃ বঃ সরকার, Notification No. 91-CI/H/4F-54/2000 dt 13-2-2001)

এরপরেও সিপিএম নেতামন্ত্রীরা বলবেন, পুঁজি বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থানের বান ডেকে যাচ্ছে?

ক্ষতিপূরণ

পুরুষানুক্রমে চাষবাস করতে অভ্যস্ত কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিলে যে ক্ষতি হয়, কিছু টাকা চাষীদের হাতে গুঁজে তা পূরণ সম্ভব কিনা, তা সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ভদ্রমহোদয়রাই বলতে পারবেন। সে যাই হোক, ক্ষতিপূরণের এই টাকাও অধিকাংশ জায়গার চাষীরা পাননি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক —

(১) **বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময় বীরভূমের চিনপাই থানার বেশ কিছু গ্রামের ধান জমি দখল করেছিল রাজ্য সরকার। জমি যায় ৬৪০ জন চাষীর।** সেটা ১৯৮৯ সাল। বলা হয়েছিল — জমির মালিকদের চাকরি দেওয়া হবে। তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন তো বটেই, বর্তমান বিদ্যুৎ ও শ্রমমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঐ প্রতিশ্রুতি দেন। **গত ১৬ বছরে চাকরি হয়েছে মোট ৪৫ জনের।** (সংবাদ প্রতিদিন, ৮-৯-০৫) জমিহারা শত শত কৃষক চাকরির দরখাস্ত কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

(২) রাজারহাটে যখন ৯০০০ একর জমি দখল করে নিউটাউন গড়ে তোলা হয় তখন বলা হয়েছিল ক্ষতিপূরণ ও চাকরি দেওয়া হবে। কী দেওয়া হয়েছে? কৃষিজমিচ্যুত প্রায় ২৬ হাজার কৃষক ও হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষিমজুর এবং সেই সঙ্গে কয়েক হাজার বর্গাদারের একজনও কোন কাজ পাননি। অথচ সরকারি জমির সওদাগর 'হিডকো' গিলে খেয়েছে হাজার হাজার বিঘা উর্বর কৃষিজমি, পুকুর, বাস্তুভিটে — সবকিছু। আর তারপর ভূমিহারা মানুষগুলো সরকারের দরজায় দরজায় রোজ হত্যে দিচ্ছে জমির দামটুকু পাওয়ার জন্য। সংবাদে প্রকাশ — **''বামফ্রন্ট সরকার ঘটা করে একদিন যে সমস্ত ভূমিহীনদের পাট্টা বিলি করেছিল, রাজারহাটের সেই জমি-হারানো পাট্টাদারদের এক বড় অংশ আজও জমির ক্ষতিপূরণ পাননি।** চকপাচুড়িয়ার তিন পাট্টাদার জুব্বার মোল্লা, গুলান মোল্লা, জলিল মোল্লা জমির ক্ষতিপূরণ না পেয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে এসব গরিব পাট্টাপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্যদের। **জুব্বার মোল্লার ছেলে রাজ্জাক মোল্লা পাগল হয়ে আজ ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে পথে পথে।''** (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১০-১০-০৫)

(৩) ফলতায় রপ্তানি এলাকা ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ২৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যাঁরা ঐ সব জমিতে চাষ করতেন তাঁরা তা করতেন বংশানুক্রমিকভাবে। আইন মোতাবেক কাগজপত্র অনেকেরই ছিল না, অনেকে চাষাবাদ করতেন দখলি-স্বত্বে — এরা কেউই ক্ষতিপূরণ পাননি। পুনর্বাসনের সময় এক একটা পরিবারকে ইউনিট ধরার ফলে বড় পরিবার, যেগুলো আসলে যৌথ নয়, কিন্তু পাশাপাশি থাকতেন তারা, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। (আই আই এম-জোকা-র ছাত্রদের ক্ষেত্রসমীক্ষা)।

(৪) নকশালবাড়ীতে আদিবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তিন ফসলি জমি — যে জমি তাদের অন্নের সংস্থান করত। আজও সেই জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

এই ধরনের আরও বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের ধাক্কায় কত শত মানুষ যে সর্বস্ব হারিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার রাস্তা বেছে নিয়েছেন কে তার হিসাব রাখে?

আর একটা কথা। রাজ্য সরকার এখন নিজেই জমি ব্যবসায়ী। রাজারহাটে চাষীদের কাছ থেকে জমি কিনেছে ৬ হাজার টাকা কাঠায়। সেই জমির ১৫০ একর কোল ইন্ডিয়াকে বিক্রি করেছে ৯৪ হাজার টাকা কাঠায় (সূত্র ঃ বিপন্ন পরিবেশ, নাগরিক মঞ্চ ২০০০)। রাজ্য সরকারের সংস্থা হিডকো এখন দর হাঁকছে প্রতি একর ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। **বারুইপুরে জমি অধিগ্রহণ করা হবে ২৬৭০ একর। এর মধ্যে ১০০ একর জেলা সদরের জন্য রেখে বাকিটা অর্থাৎ ২৫৭০ একর জমি বেশি দামে বিক্রি করে রাজ্য সরকার লাভ করবে ৩২০ কোটি টাকা।** (সংবাদ প্রতিদিন, ৩১-১-০৫)। অর্থাৎ বুদ্ধদেববাবুদের রাজ্য সরকারও এখন জমির কারবারি।

রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে প্রশ্ন তুলছেন — ''শিল্প স্থাপনের জন্য জমি লাগবে না? শিল্প কি আকাশে হবে?'' না, শিল্প যে মাটিতেই হয় — তা আমরা জানি। কিন্তু তার জন্য কি পশ্চিমবঙ্গে জমির অভাব? **সরকারি সংস্থা ওয়েবকম হিসাব কষে দেখিয়েছে যে, মাত্র ৫০০ টি বন্ধ কারখানায় জমির পরিমাণ ৪০ হাজার একর।** রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া হাজার হাজার কলকারখানায় তাহলে কত জমি আটকা পড়ে আছে তা সহজেই অনুমেয়। **শিল্প স্থাপনের জন্য কি এসব জমি ব্যবহার করা যায় না?** জেলাগুলিতে শিল্পতালুকের পড়ে থাকা হাজার হাজার একর জমিতে শিল্পস্থাপনে আপত্তি করল কে? এইসব জায়গায় শিল্পস্থাপন না করে অসহায় চাষীদের উৎখাত করার আয়োজন কেন? জবাবে সরকার বলছে, বন্ধ কারখানার জমির মালিকানা রয়েছে কারখানা মালিকদের হাতে, সরকারের হাতে নয়। তাই তা নেবার সমস্যা আছে। এই যদি যুক্তি হয়, তবে চাষীর জমির মালিকানাও তো চাষীর হাতে, সরকারের হাতে নয়। সরকার তাহলে কোন্ যুক্তিতে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করছে? আসলে এসব ধাপ্পার যুক্তি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার লক্ষ লক্ষ একর জনগণের সম্পত্তি বুদ্ধদেববাবুরা পূর্বেই মালিকদের দিয়ে দিয়েছেন। আর মালিকেরা এখন সেই জায়গায় ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে মহানন্দে কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরছে। তাই ওতে হাত দেওয়া হবে না। ওরা যে মালিক, বুদ্ধদেববাবুদের কাছে ওরা যে ভগবান! ওরা তো আর গ্রামের চাষাভুষো নয় যে, লাঠিপেটা করে ওদের জমির দখল নেওয়া যাবে!

বুদ্ধদেববাবুরা বলছেন — আগে সরকার নিজেই জমি পছন্দ করত, এখন শিল্পপতিরা জমি পছন্দ করবে, আর সরকার তা অধিগ্রহণ করে তাদের হাতে তুলে দেবে। আমাদের প্রশ্ন — মার্কিনি ফোর্ড কোম্পানি যদি মোটরগাড়ির কারখানা করার জন্য গোটা সল্টলেকটাই পছন্দ করে, তখন বুদ্ধদেববাবুরা তা অধিগ্রহণ করে দিতে পারবেন তো? আমরা জানি, বুদ্ধদেববাবুদের সে হিম্মত হবে না। যাদের সেবায় বুদ্ধদেববাবুদের সপ্তমবার গদিতে আরোহণ, তাদের অনেকে ওখানকারই বাসিন্দা। তাই সহজেই বলা যায়, সিঙ্গুর, ডানকুনি, ভাঙড়, রাজারহাট — সর্বত্র কৃষকদের উচ্ছেদ হতে হয়েছে ও হচ্ছে, কারণ তারা গরিব, অসংগঠিত, অসহায়।

বুদ্ধদেববাবুরা জানেন, যাঁদের আশীর্বাদে তাঁরা তিন দশক ক্ষমতায় বসে আছেন সেই মালিকশ্রেণীকে ক্রমাগত খুশি করে যেতে হবে। আর এদের খুশি করতে গেলে গরিব সাধারণ মানুষকে লুণ্ঠনের দরজা বেশি বেশি করে খুলে দিতে হবে। ক্ষমতায় টিকে থাকার বাধ্যবাধকতায় সিপিএম নেতৃত্বকে মালিকদের সেবা করে যেতেই হবে, এবং সেই সেবার প্রয়োজনে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত সহ সকল শ্রমজীবী জনগণের উপর আক্রমণ হানতে হবে, প্রয়োজনে হাজার হাজার চাষীকে জমিচ্যুত করে কৃষিজমির দখল নিয়ে মালিকদের হাতে তুলে দিতে হবে। বুদ্ধদেববাবুরা পরম বিশ্বস্ততায় এই কাজটিই করে চলেছেন — রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণের প্রতি, বিশেষত কৃষক সমাজের প্রতি এ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

সিপিএম আগে কী বলেছিল

''অধিকাংশ অ-বাম রাজ্য সরকার জমিরপূর্বেকার ঊর্ধ্বসীমা আইন ও বর্গা আইনকে শিথিল করে দিয়ে ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়াকে উল্টো পথে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব রাজ্য সরকার হাজার হাজার হেক্টর জমি নামমাত্র দামে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হয় বিক্রয় করছে, না- হয় লিজ দিচ্ছে। রাষ্ট্র এখন তার করণীয় অধিকাংশ আর্থিক কাজকর্ম থেকে পিছিয়ে আসছে এবং যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করার দায়িত্ব পুঁজিবাদী বাজারের উপর ছেড়ে দিচ্ছে। বিশ্বায়ন নীতির অংশ হিসাবে সরকার সেচ, বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে এবং তার ফলে জনস্বার্থে গ্রামীণ উন্নয়ন অসম্ভব করে দিয়েছে।'' (২০০৩ সালের জুন মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কৃষক ও কৃষি মজুর ফ্রন্টের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত)।

এখন কী বলছে

বাজার চলে তার নিজস্ব নিয়মে। পুঁজি বিনিয়োগকারীরা মুনাফা চায়, তারা পশ্চিমবঙ্গকে ভালবেসে এই রাজ্যে আসছে না। শিল্প আকাশে হয় না। জমি অধিগ্রহণ করতেই হবে। যারা বসতবাড়ি অথবা ২/৩ ফসলি জমি হারাবেন সরকার তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে, তারা বিকল্প জীবিকায় যেতে পারেন, এমনকী নিজস্ব ব্যবসাও শুরু করতে পারেন। (বিমান বসু, সম্পাদক, সিপিএম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা)।

পেট্রল-ডিজেল

দামের অর্ধেকেরও বেশি সরকারি ট্যাক্স

তিনের পাতার পর

অস্তিত্ব নিরাপদ করা। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারি সুযোগসুবিধা হাতিয়ে নেওয়া, তৃতীয়ত, গণআন্দোলনের রাস্তায় পা না দেওয়ার পক্ষে একটা অজুহাত তৈরি করা। একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রকৃত বামপন্থীদের কাছে সরকারের বিকল্প মানেই গণআন্দোলন। যার দ্বারাই একমাত্র একটা জনবিরোধী বুর্জোয়া সরকারকে জনগণের দাবি শুনতে বাধ্য করা সম্ভব। সি পিএম এখন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাহারাদার হওয়ার জন্য দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। নিজেদের এই চরিত্র কর্মীমহল ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনগণের কাছ থেকে আড়াল করার জন্যই তারা কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন দেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই —এই তত্ত্বটি বাজারে ছেড়েছেন।

তেলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো অন্তঃশুল্কের শতকরা হার ভারতেই সবচেয়ে বেশি

	পেট্রল	ডিজেল
পাকিস্তান	২%	০
থাইল্যাণ্ড	১২%	৮%
ফিলিপাইন	১১%	০
চীন	৫%	২%
ইন্দোনেশিয়া	৪%	৪%
বাংলাদেশ	১১%	১১%
***ভারত**	**৩২%**	**১৬%**

(সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস, ১৪-৬-০৬)

* এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সেস এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ট্যাক্স ও সেস যোগ করলে শুধু সরকারি করই দাঁড়ায় তেলের মোট বাজারদরের অর্ধেকেরও বেশি।

শহীদ আবদুল ওদুদ স্মরণসভা

এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য, তেহট্ট থানা অঞ্চলের বিশিষ্ট জননেতা শিক্ষক কমরেড আবদুল ওদুদকে ১৯৯৮ সালের ২৯ মে সিপিএম ঘাতকবাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই দিনটিতে প্রতি বছর অঞ্চলের মানুষ এক সভায় মিলিত হয়ে শহীদ কমরেড ওদুদের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও দলের আদর্শকে স্মরণ করেন। এবছরও ২৯ মে বারুইপাড়ায় স্মরণসভা আয়োজিত হয়েছিল। রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড খোদা বক্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী ও ওদুদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড ইসমত আরা খাতুন।

ভারত এগোচ্ছে, তবে কোন্ ভারত !

দিন কয়েক আগের খবর — এক সন্তানসম্ভবা মা শহরের নানা হাসপাতালে ঘুরে বেড না পেয়ে অবশেষে হাসপাতালের সামনে একটি গাছের তলায় সন্তান প্রসব করেছেন। এ খবরও প্রায়ই চোখে পড়ে যে, সুদূর কোন গ্রাম থেকে সাপে কাটা রোগীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে আসার পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়াও ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নেই, সদ্যোজাত শিশুকে কুকুরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে — স্বাস্থ্যব্যবস্থার এ ছবি এখন প্রায় নিত্যকার। রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার নিদারুণ দৈন্যেরই ছবি এসব।

আজকে যখন দেশের নেতা-মন্ত্রীদের মুখে 'উন্নয়ন' ছাড়া কথা নেই, তখন স্বাস্থ্যব্যবস্থার এই দৈন্য দূর করে সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা কী ব্যবস্থা করছেন? স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ছে কি? সাধারণ মানুষের চিকিৎসার মতো হাসপাতাল বাড়ছে কি? চালু হাসপাতালগুলিতে বেড ও ডাক্তার-নার্সের সংখ্যা বাড়ছে কি? না, কোন কিছুই বাড়ছে না। শুধু বাড়ছে না তাই নয়, বরং সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, জনস্বাস্থ্যখাতে সমগ্র ভারতেই সরকারি ব্যয় ক্রমাগত কমছে। ২০০২-০৩ সালে স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ খাতে সরকারি ব্যয় মোট সরকারি ব্যয়ের ৯.২ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৭.৩ শতাংশে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, জনস্বাস্থ্যে এই ব্যয় হ্রাসের কারণ কী? তবে কি দেশের শাসক নেতা-মন্ত্রীরা মনে করেন, ভারতীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্যের এমন উন্নতি হয়েছে যে, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দের আর প্রয়োজন নেই? নাকি তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি এতদূর পর্যন্ত হয়েছে যে, চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান ব্যয় তারা নিজেরাই বহন করতে সক্ষম?

দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাঁরা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল তাঁরা প্রতিদিন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে গিয়ে কী দেখেন? দেখেন ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নেই, ব্লক বা জেলা হাসপাতালগুলিতে গিয়ে দেখেন বেড নেই; এক্স-রে, রক্তপরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষা করতে গেলে অপেক্ষা করতে হয় মাসের পর মাস। এমনকী জেলার হাসপাতালগুলিতে সাপে কাটা বা কুকুরে কামড়ানোর ইঞ্জেকশনও পাওয়া যায় না। এ চিত্র গোটা দেশের সর্বত্রই প্রায় একই। সরকারি পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে, অর্থের অভাব ও মাত্রাতিরিক্ত দামের জন্য দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ নিতান্ত প্রয়োজনেও ওষুধ কিনতেই পারে না। যে ২৫ শতাংশ মানুষ ওষুধ খায় তাদের মধ্যে আবার মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ চাহিদা বা প্রয়োজনমতো ওষুধ কিনতে পারে, বাকি ২০ শতাংশ কালেভদ্রে ওষুধ কিনে খায়। রাজ্যের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই পশ্চিমবঙ্গে যত লোক প্রতি বছর হাসপাতালে ভর্তি হন তার মধ্যে ২৫ শতাংশ রোগী ও তার পরিবার চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাচ্ছে। সারা ভারতে এই হার ২৪ শতাংশ।

ভারতীয় পুঁজিবাদ আজ এতখানি শক্তিশালী যে, বনেদি পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথেও বহুক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় সামিল হচ্ছে, ভারতীয় লগ্নিপুঁজি খাটছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। অন্যদিকে পরমাণু অস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি কেনা হচ্ছে বিপুল ব্যয়ে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য জোরদার দাবি জানাচ্ছে ভারত। বিশ্বের প্রথম সারির পুঁজির মালিক বা ধনীদের তালিকায় ভারতীয় শিল্পপতিরা স্থান করে নিচ্ছে। অথচ, ভারত বলতে যে গরিষ্ঠ ভারতবাসীকে বোঝায় তারা আজও পড়ে রয়েছে অন্ধকারে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডেঙ্গু, কালাজ্বর প্রভৃতি যে রোগগুলি একসময় প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি আবার ফিরে আসছে এবং কখনও কখনও মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু পানীয় জলের জন্য আজও মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয় মানুষকে। পানীয় জলের অভাবে এ রাজ্যেও প্রায় ৪ কোটি মানুষ আর্সেনিকযুক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছে। যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যাও বিশাল। তবুও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দ কমছে কেন?

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করার ফলেই স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমছে। অন্যান্য পরিষেবাগুলির মতোই স্বাস্থ্যব্যবস্থাটিকেও দেশিবিদেশি পুঁজির মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র হিসাবে খুলে দিচ্ছে সরকারগুলি। এই সমস্ত পুঁজিমালিকদের উদ্দেশ্য যতখানি না মানুষকে রোগমুক্ত করা, তার থেকেও বেশি মানুষের রোগ নিয়ে ব্যবসা করা। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই বেসরকারি উদ্যোগকে শক্তিশালী করতেই সরকারি ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দের হিসেবে ১৭৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৭১। জি ডি পি-র মাত্র ০.৯ শতাংশ ব্যয় করা হয় স্বাস্থ্যখাতে। অথচ বেসরকারি ব্যয়ের হিসাবে ঠিক এর বিপরীত চিত্রটিই লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে ভারতের স্থান অষ্টাদশ।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি ব্যয় ১৯৯৮ থেকে ২০০২-এ ৭৩.৫ শতাংশ থেকে ৭৮.৯ শতাংশে উঠে এসেছে। বলাবাহুল্য এই ব্যয় রোগীদের ব্যক্তিগতভাবে মেটাতে হয়। আমাদের দেশের কতজনের এই বেসরকারি চিকিৎসা গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে? উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮৪ শতাংশ বসবাস করলেও এসব দেশে সরকারি মোট ব্যয়ের মাত্র ১২ শতাংশ চিকিৎসাখাতে ব্যয় করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের মতো দেশে সেই ব্যয়েরও বেশিরভাগটাই করে মুষ্টিমেয় ধনিক অংশের মানুষ। বিনা চিকিৎসায় থাকে বা নামমাত্র চিকিৎসার সুযোগ পায় অগণিত সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী, পারিষদ ও আমলারা যখন ভারত এগোচ্ছে বলে গলা ফাটান, তখন সেটা কাদের ভারত, তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

কোচবিহার

সিপিএম-এর তাণ্ডব প্রতিরোধে তুফানগঞ্জে আন্দোলন

বিধানসভা নির্বাচনের পর তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম দল বল্গাহীন সন্ত্রাস শুরু করেছে। নির্বাচনে এস ইউ সি আই-কে সমর্থন করার অপরাধে ১৩ মে বালাভূত অঞ্চলের নয়ারচর গ্রামের বাসিন্দা রাখাল দাসের তাঁতঘরে কর্মরত সাতজন শ্রমিককে সিপিএম মিছিল করে এসে জোর করে কাজ থেকে তুলে দেয়, ঘরের কাজে নিযুক্ত কাঠ মিস্ত্রিকেও তাড়িয়ে দেয়। দেওচড়াই অঞ্চলে এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড কিশোরীমোহন মোদকের ওপর মজুর বয়কটের ফতোয়া জারি করে। ২৪ মে দেওচড়াই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় সিপিএম-এর ভৈরববাহিনী মিছিল করে তাণ্ডব নৃত্য চালায়, নিরীহ লোকের দোকান ভাঙচুর করে, মারধোর করে, জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়। স্থানীয় বিধায়ক এবং সিপিএম-এর জেলা নেতৃত্ব এসবে প্রত্যক্ষ মদত দেয়।

আক্রান্ত মানুষেরা এস ইউ সি আই অফিসে আসতে থাকেন। এদের প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সংশ্লিষ্ট থানা, এস ডি ও, এস পি, এমনকী জেলা শাসককে জানানো হয়। কিন্তু প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা ও নিষ্ক্রিয়তায় সিপিএম-এর ভৈরববাহিনী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে সন্ত্রাস বন্ধে গ্রামে গ্রামে 'সন্ত্রাস-বিরোধী কমিটি' গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ডেপুটেশনের পর গত ৫ জুন তুফানগঞ্জ শহরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়।

১৩ জুন পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তুফানগঞ্জে মিছিল

'মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে'

একের পাতার পর

বোঝায় বিপর্যস্ত এ'রাজ্যের মানুষ। শিক্ষা ও চিকিৎসা এখন বাজারের মহার্ঘ পণ্য। এর উপর আছে কর্মহীনতার সমস্যা। লক্ষ লক্ষ বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে, কলকারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কর্মহীন বেকার মজুর অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছে। দিনের পর দিন সমাজে বেড়ে চলেছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ। রমরমিয়ে চলছে নারী পাচারের ব্যবসা। মুখে যতই উন্নয়নের কথা বলুক, গত তিন দশকের শাসনে এ'রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার মানুষকে এই সর্বাত্মক সঙ্কট থেকে উদ্ধারের কার্যত কোনও চেষ্টাই করেনি শুধু নয়, দিনে দিনে এই সঙ্কট আরও তীব্র হয়ে ওঠারই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। 'বাম' নামধারী সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এখন নিজেকে পুঁজিবাদী পথের পথিক হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার অর্থ, শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা ও আয়োজন নয়, পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্যই সিপিএম ও তার সরকার কাজ করছে। এই পুঁজিবাদ মানে কেবল অর্থনীতি নয়। পুঁজিবাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও আছে, যার লক্ষ্যই হল, সমাজের সাংস্কৃতিক মনন, রুচি-নীতির মানটাকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে তা শোষণমূলক পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। আজ পুঁজিবাদ পচা-গলা একটি ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, ফলে তার সংস্কৃতিটাও একইরকম পচা-গলা হতে বাধ্য। যদি কোথাও তা না হয়ে থাকে, তবে পুঁজিবাদের পথিক সরকার, প্রচার-মাধ্যম ও কলমজীবীরা সমবেতভাবে চেষ্টা চালায় যাতে সমাজের রুচি সংস্কৃতির মানকে ধসিয়ে দেওয়া যায়। অন্যথায় পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়াবেই।

এ রাজ্যেও সঙ্কটজর্জরিত খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের বুকে জমে ওঠা ক্ষোভের আগুন যদি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেয়, যদি তারা সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুঁজে নিয়ে সংগঠিত হয়ে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইতে সর্বাত্মকভাবে সামিল হন — গোটা বিশ্বের পুঁজিপতিশ্রেণীর মতো এ রাজ্যের পুঁজি-মালিকরাও সেই আতঙ্কে সর্বদা আতঙ্কিত। বিশেষত, এই বাংলার যুবসমাজ চিরকালই দেশে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের সামনের সারিতে থেকেছে। প্রাণের পরোয়া না করে এদেশের ছেলেমেয়েরা দলে দলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে তারা। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পুঁজিপতিশ্রেণী যখন এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল, তখন সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসা যেকোন আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এই বাংলার তরুণ প্রাণ। গত শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে প্রবল গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে পুঁজিমালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেস সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তারা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা ছিল 'দুঃস্বপ্নের নগরী'।

তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার স্বার্থরক্ষাকারী এ'রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার এক সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছে। একদিকে মদের ঢালাও লাইসেন্স, অন্যদিকে স্কুলস্তরে জীবনশৈলী শিক্ষা ও এইডস্ সম্পর্কে সতর্কীকরণের নামে প্রকাশ্যে রাস্তার হোর্ডিং-এ, রেডিওতে, সংবাদপত্রে ক্রমাগত অশ্লীল প্রচারের মাধ্যমে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার পরিকল্পিতভাবে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে তৎপর হয়েছে। এদেশের তরুণ, সজীব প্রাণগুলিকে ভোগের নেশায় ডুবিয়ে, যৌনতা-সর্বস্ব জীবনের মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদের বিবেক, মনুষ্যত্ব, নীতি-আদর্শ ধ্বংস করে তাদের বিপথগামী করে দেওয়াই হল তাদের লক্ষ্য। কারণ মানুষের বিবেককে হত্যা করতে পারলে, তাকে দায়িত্বহীন, নীতি-নৈতিকতাহীন যৌন প্রবৃত্তির আদিম তাড়নায় ভাসিয়ে দিতে পারলে তার যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী চেতনার মৃত্যু ঘটে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের উপর বেড়ে চলা অমানুষিক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো নৈতিক বল তার চরিত্রে অবশিষ্ট থাকে না। ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী বছরের পর বছর তার অত্যাচারের 'স্টিমরোলার' অবাধে চালিয়ে যেতে পারে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেয়েও সে লড়ে, যদি মনুষ্যত্ব থাকে।"

তাই দেখা যাচ্ছে, 'বামপন্থা'র তকমাধারী এ'রাজ্যের সরকার পুঁজিবাদের দাসত্ববৃত্তি করতে গিয়ে মার্কসবাদের উন্নত রুচি, মূল্যবোধ, আদর্শকে কালিমালিপ্ত করে এদেশের তরুণ সমাজকে নোংরা, কুৎসিত অবাধ যৌনতার দিকে প্ররোচিত করার দ্বারা তার মনুষ্যত্বকে মেরে দেবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক দেশের মানুষের নৈতিকতা ধ্বংসের সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নজরুল লিখেছিলেন — 'ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হাড়ে, মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে।' রাজ্যে সিপিএমও সেই নব ফেরাউন রূপে মনুষ্যত্ব মারার আয়োজন করছে। এস ইউ সি আই-ই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা এই অশ্লীল সরকারি প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ গড়ে তুলেছে। দলের মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস, যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও এবং ছাত্র সংগঠন ডি এস ও বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। এই অশ্লীল প্রচার বন্ধের দাবিতে যে ব্যাপক জনসমর্থন আমরা দেখছি, অন্ধকারের মধ্যে সেটাই আশার আলো।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

গণদাবী ২৩ - ২৯ জুন, ২০০৬ ৫৮ বর্ষ / ৪০ সংখ্যা

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মানুষকে কী দিচ্ছে

বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশের মোট জনসংখ্যার —

* প্রতি তিনজনে একজন বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পায় না।
* প্রতি পাঁচজনে একজন বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।
* ২৮০ কোটি মানুষের আয় দৈনিক ২ ডলারের কম।
* ১১০ কোটি মানুষ দিনে ১ ডলার বা তার কমে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।
* প্রতি বছর ক্ষুধায় আর চিকিৎসার অভাবে ৩০ হাজার শিশু মারা যায়।
* দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের মিলিত আয় যা, পুঁজিবাদী দুনিয়ার ১ শতাংশ ধনীর আয় তার সমান।

সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের অবস্থা

* ৩০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর।
* ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক- অষ্টমাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।
* মার্কিন দেশের দরিদ্রদের শতকরা ২০ ভাগ প্রতি বছর আশ্রয়হারা হয়; বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন এমনকী ঘর গরম রাখার উপায় থেকে এরা বঞ্চিত এবং তাদের পেট ভরে খাওয়া জোটে না।
* বছরে ৫০ হাজার শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়।
* মাদকাশক্তি ক্রমবর্ধমান; গণিকাবৃত্তি, নানারকম অপরাধের ''স্বাধীনতা'' বুর্জোয়া গণতন্ত্র দিয়েছে।

(সূত্র ঃ ইউক্রেন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা রাবোচি — ক্রিস্তিয়ানস্ক্যা প্রাভদা, জুন ২০০৬ সংখ্যা)

— কেন এমন হয়? কারণ পুঁজিবাদে উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা। মুনাফার উৎস হল শোষণ, পরিণাম হল বৈষম্য। তাই একদিকে মুষ্টিমেয়র হাতে অপরিমিত ধনৈশ্বর্য, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনাহার।

সোভিয়েট সমাজতন্ত্র কী দিয়েছিল?

* ১৯২৮ থেকে '৩৮ — এই দশ বছরে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বেড়েছিল ৪০ শতাংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের পাঁচ বছর শস্যের উৎপাদন বেড়েছিল ২৭ শতাংশ।
ফলত দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক কেটে গিয়েছিল।
* পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি জনগণের সোৎসাহ অংশগ্রহণে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে শিল্পপুঁজি ছিল ৬ হাজার ৪ শত কোটি রুবল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তা বেড়ে হয় ১৩ হাজার ৩ শত কোটি রুবল।
* ১৯৩২ সালে কৃষিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের মোট পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ ৫০ হাজার অশ্বশক্তি, ১৯৩৭ সালে তা বেড়ে হয় ৮০ লক্ষ অশ্বশক্তি।
* ১৯২৯ সালের মজুরিকে ১০০ ধরলে ১৯৩৭ সালে আমেরিকায় মজুরিবৃদ্ধি ঘটে ৮৬ শতাংশ, গ্রেট ব্রিটেনে ৯৮ শতাংশ, জার্মানিতে ৭৯ শতাংশ, ফ্রান্সে ১১৩ শতাংশ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ৩১৭.৪ শতাংশ।
ফলত বেকার সমস্যার সমাধান হয়, অনাহার ইতিহাসের পাতায় চলে যায়।
* শিক্ষায় শুধু নিরক্ষরতা দূর নয়, সর্বস্তরে অবৈতনিক শিক্ষা ও তার উচ্চমান রবীন্দ্রনাথ সহ বিশ্বের প্রথম সারির শিক্ষাবিদ্‌দের বিস্মিত করে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লেনিন প্রদর্শিত পথে কাঠের লাঙলের যুগ থেকে রাশিয়া পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করে এবং বিশ্বশান্তির অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হয়।

শিক্ষার মতো স্বাস্থ্যও ছিল সকলের জন্য সর্বস্তরে নিখরচায়।

* সর্বোপরি সমাজতন্ত্র সোভিয়েটের মানুষকে নতুন যুগের নতুন মানুষ হিসাবে দেহে-মনে গড়ে তুলেছিল, রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিলেন — ''যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে...যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা যায় না।''

[তথ্যসূত্র ঃ সোস্যালিস্ট সিস্কথ অব দি ওয়ার্ল্ড — হিউলেট জনসন (আর্চ বিশপ অফ ক্যান্টারবেরি), রাশিয়ার চিঠি — রবীন্দ্রনাথ]

পুঁজিবাদ যা পারে না, সমাজতন্ত্র তা পারে কী করে? কারণ পুঁজিবাদে উৎপাদন হয় ব্যক্তি মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য নয়। সমাজতন্ত্রে ঠিক উল্টো হয়। সমাজতন্ত্রে শোষণ থাকে না, মালিক থাকে না, মুনাফা আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয়র সমৃদ্ধি ঘটে না। উৎপাদন হয় মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে। সামাজিক সম্পদের সমবণ্টনের ফলে সমৃদ্ধি ঘটে সর্বস্তরে। সর্বোপরি জনগণের নিজস্ব পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় থাকায় জনগণের সামগ্রিক উন্নতি ঘটাবার লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে বিক্ষোভ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির দাবিতে ১৫ জুন কলকাতায় এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

'হাদিথা গণহত্যা'

পাঁচের পাতার পর

দেশপ্রেমিকদের লুকিয়ে রাখার শাস্তি হিসাবে মার্কিন সেনারা তাই নির্বিচারে হত্যা করছে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের। ইরাকি নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবার চেষ্টা করছে। হাদিথা গণহত্যার ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে মার্কিন সেনাবাহিনীর এক অফিসার 'লস এঞ্জেলস্ টাইম্‌স' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে মন্তব্য করেছেন যে, ইরাকে মার্কিনবাহিনীর দুরবস্থা দেখে সেনাদের নৈতিক বল ভেঙে পড়েছে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ সহ্য করতে না পারার ফলেই দিশাহারা মার্কিন সেনারা নিরীহ ইরাকিদের হত্যা করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও আজ প্রবল চাপের মধ্যে। একদিকে ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দুঃসাহসিক সংগ্রামের সামনে মার্কিন সেনাবাহিনীকে পিছু হঠতে হচ্ছে; অন্যদিকে গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, এমনকী খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আজ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। যে সেনাবিভাগে যোগ দিতে পারলে একসময় গর্বিত হত ইংল্যান্ডের যুবকরা, সেই ব্রিটিশ সেনাবিভাগ আজ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী রিক্রুট করতে পারছে না। সেদেশের মায়েরা আজ রুখে দাঁড়িয়েছেন ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাঁরা নিজেদের সন্তানদের নিরীহ মানুষের রক্তে হাত রাঙাতে বাধা দিচ্ছেন। আমেরিকাতেও আজ যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে মানুষের ঢল নামছে। আতঙ্কিত বুশ ও ব্লেয়ার গত ২৫ মে ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রথমবার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইরাক যুদ্ধ ভুল ছিল এবং এ যুদ্ধে তাঁদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধারা যে এত বেগ দেবে তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। যদিও সাংবাদিক সম্মেলনে ইরাক থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার পরিকল্পনার কথা মানতে তাঁরা রাজি হননি, তবুও এ'কথা আজ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম বিজয়ের খোয়াব শিকেয় তুলে রেখে সেদেশের গেরিলা যোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুখে চুন-কালি মেখে যেভাবে ঘরে ফিরে এসেছিল, সেভাবেই ইরাক থেকেও তাদের পাততাড়ি গোটাতে হবে।

(সূত্র ঃ দ্য স্টেটসম্যান ৮-৬-০৬ এবং আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ৮-৬-০৬)

বিদ্যুতের মাশুল কমানো ও সরকারি ভর্তুকির দাবিতে অ্যাবেকার ডাকে

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মহাকরণ অভিযান

২৯ জুন, জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ২টা

২৬ জুন এ আই ডি ওয়াই ও-র ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

যুব সমাবেশ

মহাজাতি সদন, বেলা ৩টা

***প্রধান বক্তা ঃ* কমরেড মানিক মুখার্জী**

***বক্তা ঃ* কমরেড স্বপন দেবনাথ, রাজ্য সম্পাদক, এ আই ডি ওয়াই ও**

***সভাপতি ঃ* কমরেড সুরথ সরকার, রাজ্য সভাপতি, এ আই ডি ওয়াই ও**

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in